আনন্দবাজার পত্রিকা
অনলাইন সংস্করণ

অস্পৃশ্যতা এখনও প্রবল

বর্ণহিন্দুদের তোষণ, না কি একটা আপসে পৌঁছনোর চেষ্টা?

শান্তভানু সেন

২৬ অক্টোবর, ২০২০

একটি ভারতীয় দল ১৯১১ সালে ক্রিকেট খেলতে যায় ইংল্যান্ডে। দলটির সেরা বোলার ছিলেন পি বালু, জাতিতে চামার। সে সময় একটি প্রতিযোগিতা হত, যাতে হিন্দু, মুসলিম, পার্সি ও ইউরোপিয়ানরা অংশ নিতেন। ১৯১৯ সালে বালুকে জাতপাতের কারণে হিন্দু দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। উচ্চবর্ণীয়রা বালুর সঙ্গে প্যাভিলিয়ন শেয়ার করতেন না, তাঁর জন্য ছিল আলাদা চায়ের পাত্র। কিন্তু বালুর স্পিনের ভেলকিতে ইউরোপিয়ানরা পর্যুদস্ত হন। রানাডের মতো নেতা বালুকে মালা পরিয়েছিলেন। টিলকও বালুর সমর্থনে বক্তব্য রেখেছিলেন। বালুর নাম সরাসরি না করেও গাঁধীজি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে কণ্ঠস্বর জোরালো করলেন, তার ফলে বালুকে দলে ফেরানো হল।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বাপু প্রথম হস্তক্ষেপ করেন কেরলের বৈকাম শহরে। বৈকাম মন্দিরের নাম্বুদ্রি ট্রাস্টিকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে রাস্তা দিয়ে অহিন্দু, অপরাধী, দুশ্চরিত্র, কুকুর, শেয়াল ঘুরে বেড়ায়, সেই রাস্তা কেন তথাকথিত নিচু জাতির মানুষ ব্যবহার করতে পারবেন না? ট্রাস্টি জবাব দেন, ওঁরা তাঁদের কর্মফল ভোগ করছে। বাপু জবাব দিয়েছিলেন, "ধরে নিচ্ছি তাঁরা তাঁদের পূর্বজন্মের কর্মের জন্য অস্পৃশ্য হয়ে জন্মেছেন, সেটাই তো তাঁদের যথেষ্ট শাস্তি। তাঁদের শাস্তি বাড়ানো হচ্ছে কেন? তাঁরা কি অপরাধী বা জীবজন্তুর থেকেও নিকৃষ্ট?" ট্রাস্টি নিরুত্তর ছিলেন।

ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র লিখেছেন, ১৯২০-র দশকের প্রথম দিকে গাঁধীজি বর্ণব্যবস্থার নিন্দা করেননি, যদিও অস্পৃশ্যতা ও জাতিগত নিপীড়নের বিরোধিতা করেছিলেন। অবশ্য, ১৯৪০-এর দশকে মহাত্মা বর্ণব্যবস্থার সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।

প্রথম দিকে তিনি ভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ সমর্থন করেননি। কিন্তু পরবর্তী কালে নিজে তাঁর আশ্রমে এই ধরনের বিবাহের আয়োজন করেন। গাঁধীজি বলেছিলেন, অস্পৃশ্যরা হিন্দু সমাজের থেকে পৃথক নয়।

১৯২১ সালের ৪ মে ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় তিনি লিখছেন, "আমি পুনর্জন্মে আগ্রহী নই। কিন্তু যদি আমার পুনর্জন্ম হয়, তা হলে আমি যেন অস্পৃশ্য হয়েই জন্মাই।"

১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে তিনি চার বার মাদুরাই গেলেও মীনাক্ষী মন্দিরে প্রবেশ করেননি। দলিত সম্প্রদায় যত দিন না মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, তত দিন বাপু মন্দিরে প্রবেশ করেননি। জাতপাতের বৈষম্যের প্রতিবাদ করায় পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়। তাঁর আন্দোলনের ফলে বহু বড় মন্দির হরিজনদের প্রবেশাধিকার দিতে বাধ্য হয়। জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, গাঁধীজির আন্দোলন হিন্দুবর্ণের কুসংস্কারের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে দলিত শ্রেণির সম্মেলনে তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলেন যে, যত দিন হিন্দুরা অস্পৃশ্যতাকে ধর্মের একটি অঙ্গ বলে মনে করবেন, তত দিন স্বরাজ আসতে পারে না।

১৯২৬ সালে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গেলেন, তাঁর কর্মসূচি হল খাদির প্রচার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনৈতিক পরিসরে নানা বিষয়ে তাঁর মতান্তর ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' প্রবন্ধে লিখছেন, "মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে— তাদেরই আপন বেশে... ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে?" সতীনাথ ভাদুড়ির কালজয়ী

‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসে ঢোঁড়াই বলছে— “গানহি বাওয়া (গাঁধীজি, যিনি সাদি বিয়া করেননি, নাঙ্গা থাকেন বিলকুল) মেথর মেথরানীদের খুব ভালোবাসেন... তাঁকেই বলা যায় জুলুম আর বেইজ্জতির একটা কিছু বিহিত করতে।” ১৯৩২ সালে পুণে চুক্তি অনুযায়ী, হিন্দু সমাজকে বর্ণহিন্দু ও তফসিলভুক্ত হিন্দু— এই দুই ভাগে বিভক্ত করার প্রতিবাদে পুণের ইয়েরওয়াড়া জেলে আমরণ অনশন করেন। তাঁর অনশন ভঙ্গ করিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

অম্বেডকর অবশ্য বলেছিলেন যে, গাঁধীজি বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে যেতে চান না, তাদের তোষণ করেই তাঁর জীবন কেটেছে। তিনি স্বরাজ বা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা যতটা বলেছেন, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কিছুই প্রায় করেননি। মনে রাখতে হবে, প্রধানত গাঁধীর উদ্যোগেই ১৯৪৬ সালে নেহরু অম্বেডকরকে তাঁর মন্ত্রিসভার আইনমন্ত্রী করেছিলেন এবং মহাত্মার উৎসাহেই অম্বেডকর হয়েছিলেন সংবিধান প্রণয়নকারী কমিটির প্রধান। অমর্ত্য সেন আনন্দবাজারে একটি সাক্ষাৎকারে (‘আমরা তো মোটামুটি গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের তলায় পড়েছি’, ১৮-৭-১৭) বলেছেন— “আমি মনে করি গাঁধী আসলে চেষ্টা করেছিলেন উঁচু জাতের হিন্দুদের সঙ্গে আপস করে অন্য কিছু ব্যাপারে তাদের রাজি করাতে। যেমন, জাতপাতের তেজ কমানো, রিজ়ার্ভেশন বা সংরক্ষণ চালু করা এবং সর্বত্র ‘নিচু’ জাতের মানুষের প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।’’

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে কারাবরণের পরে গাঁধীজি যখন আগা খান প্যালেস থেকে মুক্তি পেলেন, তখন পঞ্চগণিতে প্রার্থনা সভায় যাওয়ার পথে এক যুবক তাঁকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল। ভিখু দাজি ভিলায়ে নামক কংগ্রেস সেবাদলের এক যুবকের তৎপরতায় আক্রমণকারী ধরা পড়ে। পুলিশের হাতে না দিয়ে গাঁধীজি যুবকটিকে ক্ষমা করে দেন। সেই যুবকের নাম, নাথুরাম গডসে।

গাঁধীজির ১৫০তম জন্মদিনে শাসক দলের এক মহিলা সাংসদ গডসেকে ‘দেশপ্রেমিক’ আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ভারতীয় সংবিধান ১৭ নম্বর ধারায় যে কোনও ধরনের অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ বেআইনি ঘোষণা করে। কিন্তু তার পরেও ৭০ বছর কেটে গিয়েছে। এখনও দেখা যাচ্ছে যে, অস্পৃশ্যতা প্রবল ভাবেই রয়ে গিয়েছে। গাঁধীর নিজের রাজ্য গুজরাতেই ঘোড়া চড়া বা গোঁফ রাখার ‘অপরাধ’-এ অস্পৃশ্যদের নিপীড়ন এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে।

অমিত থোরাট এবং ওঙ্কার জোশী তাঁদের সাম্প্রতিক গবেষণায় তুলে ধরেছেন যে, এখনও ভারতের শহরাঞ্চলে ২০ শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলে ৩০ শতাংশ মানুষ অস্পৃশ্যতা অনুসরণ করে থাকেন। ক্রমাগত আছড়ে পড়া ঘটনার স্রোত, প্রস্তরযুগীয় বর্বরতা আমাদের নিক্ষেপ করছে হতাশার কৃষ্ণগহ্বরে। গণতন্ত্রের শববাহকেরা মেতে উঠেছে এক আদিম উন্মাদনায়। উন্নয়নের ভূপতিত অবস্থার পাশাপাশি

চলেছে শকুনের নৈশভোজ। তথাকথিত মানবসভ্যতার পোড়ো জমিতে প্রতিনিয়ত উঠে আসছে দলিত মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণের ঘটনা।

বিশিষ্ট হিন্দি কবি রাজেশ জোশীর কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে শেষ করি—

“আমরা সেই সময়ের নাগরিক যেখানে/ কোনও স্মৃতি নেই স্বপ্ন নেই/ একমুঠো নুন যে ঢেউ তুলেছিল তা মিলিয়ে গিয়েছে/ বালির উপরে পড়ে রয়েছে মরা মাছ, শামুক ও কাঁকড়া।’’